জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৯, পৃঃ ১২৫-১৪২
© ২০১৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দারিদ্র্যের লিঙ্গীয় ধরন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে পথবাসী নারীর প্রান্তিকতা

রাবেয়া খাতুন*
মোঃ আবদুর রহমান**

ভূমিকা :

উন্নয়ন ডিসকোর্সে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন সংস্থাগুলো যেমন বৈধতা পায় তেমনি তাদের বিভিন্ন প্রকল্পেরও বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় সত্তর এর দশকের শুরুতে। এরই ধারাবাহিকতায় আশির দশক থেকে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ত্রান, পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, ক্ষুদ্রঋণ এসব বিষয়ের উপর জোর দিয়ে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়। কিন্তু, সকল ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যকে সমরূপ হিসেবে দেখানোর মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগুলো হাতে নেয়া হয়েছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা চলেছে। স্থানীয় মানুষের মূল্যবোধ, ভাবনা, মতাদর্শ, প্রাত্যহিক কর্মকান্ড, জীবন প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিশ্লেষণ না করেই দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। এই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীগুলোর মূল টার্গেট নারী হলেও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে নারীরা এই কর্মসূচীগুলোর মধ্যে অধস্তন থেকে যায়। কারণ দারিদ্র্যকে দেখবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংস্থাগুলো নারী এবং পুরুষকে সমগোত্রীয় হিসেবে ধরে নেয়। কিন্তু নারী ও পুরুষের দারিদ্র্যের কারণ, দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যের মুখে টিকে থাকার বা তা হতে উত্তরণের ক্ষমতা ভিন্ন। এ ধরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নগর দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংস্থাগুলো পথবাসী দরিদ্র নারীদের

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা
ই-মেইলঃ rabeyarabu83@gmail.com
** প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।
ই-মেইলঃ arahman_anthro@yahoo.com

জন্য যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করে তা পথবাসী দরিদ্র নারীর বাস্তবতার সাথে কতখানি সংগতিপূর্ণ তা আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ।

তত্ত্বীয় ধারনায়ণকে বিশ্লেষণের পাশাপাশি মাঠকর্মের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা প্রবন্ধটিকে সাজানোর চেষ্টা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো যে সকল দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে সেগুলোর অধিকাংশই নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও সেখানে নারীর দারিদ্রকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়না ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে লিঙ্গীয় অসমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিষয়ক ভাবনাগুলো আগে থেকেই ছিলো, তবে ২০০৯ সালে রাজধানী ঢাকার পথবাসীদের উপর একটি গবেষণা কাজ[১] করতে গিয়ে ভাবনার জায়গাগুলো স্পষ্ট হয়েছে। আর সেই আগ্রহ থেকেই ২০১৩ সালে আবার মাঠে যাই এবং বোঝাবুঝির জায়গাগুলোকে আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করি। গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বিভাগীয় শহর ঢাকাকেই বেছে নেয়ার একটি কারণ ছিল এটি নগর দরিদ্রদের প্রধান আবাসস্থল। ঢাকার যে দুইটি ফুটপাতের পথবাসী দরিদ্র নারীদের মধ্যে আমরা গবেষণা করি তার একটি হলো 'কারওয়ান বাজার' এ 'প্রথম আলো' অফিস সংলগ্ন ফুটপাত এবং অন্যটি গ্রীনরোডের ফুটপাত।

বিবিএস (২০০৮) এর তথ্যানুযায়ী, প্রায় পনের থেকে বিশ হাজার মানুষ ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় (বিশেষতঃ লঞ্চ ঘাট, রেলস্টেশন, বাস স্টেশন, বাজার, মাজার শরীফ, পার্ক, ফুটপাত ইত্যাদি) বসবাস করে। প্রধানত নদী ভাঙ্গন ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গ্রামের মানুষ তাদের জমি, আবাসন এবং কাজের সুযোগ হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় আশ্রয় নেয়। আবার এদের মধ্যে অনেকেই ফুটপাতে কিংবা রাস্তায়ই জন্মেছে এবং এখানেই বড় হয়েছে। পথবাসীদের উপার্জনের উৎস মূলত পণ্য খালাসীকরণ, নগরের ডাস্টবিন পরিস্কার, তরকারীর ট্রাক থেকে তরকারী সংগ্রহ করে বিক্রি করা, কাগজ সংগ্রহ করে বিক্রি, ফুল বিক্রি ইত্যাদি। পথবাসীরা যা উপার্জন করে তার পুরোটাই মূলত তারা খাবারের জন্য ব্যয় করে। গুনগত ও মান সম্মত খাবার, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাশন ইত্যাদির ব্যবস্থা তারা করতে পারে না। স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় ও নিম্ন মর্যাদার কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। নির্ধারিত মানদন্ড পূরণ না করতে পারার কারণে তারা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও বিভিন্ন তৃনমূল সংগঠন থেকে কোন রকম সঞ্চয় ও ঋণ সুবিধাও পায় না। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগিতাও তাদের অনেক কম।

নগরের এই পথবাসী মানুষদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের উদ্যেগে ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে

পথবাসী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই পথবাসী কেন্দ্রগুলো সাধারণত সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার সপ্তাহে ছয় দিন) খোলা থাকে। এখানে পথবাসীদের দিনের বেলায় বিশ্রামের ব্যবস্থা, গোসল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, কর্মজীবি পথবাসী মায়েদের সন্তানদের রাখার জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র সুবিধা, বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ, পরামর্শ প্রদান ও আলোচনা, কারিগরি বা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়ই দরিদ্র পথবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো দরিদ্র নারীর লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে বিবেচনায় না এনেই তাদের কর্মসূচীগুলো চালিয়ে যায়। দেখা যায় দরিদ্র হওয়ার কারণে নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা যেমন নারী একাই ভোগ করে তেমনি পুনরুৎপাদন ও জৈবিক মাতৃত্ব, যা নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করেছে; এ কারণেও নারীর দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা পুরুষের থেকে ভিন্ন। একইভাবে নগরের ভৌত অসুবিধাসমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীকেই ভোগ করতে হয়। আমরা নগরের পথবাসী দরিদ্র নারীদের মধ্যে গবেষণা করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পথবাসী দরিদ্র নারীদের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (যেমন : স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতি) গ্রহণ করে থাকে সেগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে বিবেচনায় না এনেই করে থাকে যেখানে নারীর 'এজেন্সি' কে অনেকাংশেই অস্বীকার করা হয় এবং আদতে এটি দরিদ্র পথবাসী নারীদের দরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তা থেকে উত্তরণের পরিবর্তে তাকে আরো অধস্তন/ প্রান্তিক করে তোলে।

ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিন্যস্ত। প্রথম অংশে, উন্নয়ন আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও এর সাথে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতা আবিষ্কারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব। দরিদ্রতাকে কিভাবে সমরূপ ক্যাটাগরি হিসেবে নির্মাণ ও পরিবেশন করা হয় সেই আলোচনাও থাকবে এ অংশে। দ্বিতীয় অংশে, দারিদ্র্যের লিঙ্গীয় ধরন[২] আলোচনার পাশাপাশি কোন যুগসন্ধিক্ষণে এবং কি প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের সাথে নারী যুক্ত হলো সেই আলোচনা তুলে ধরব। তৃতীয় অংশে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পলিসি প্রক্রিয়া কিভাবে লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে অস্বীকার করে সেটি চিহ্নিত করব। পাশাপাশি রাষ্ট্র ও উন্নয়ন সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতায় যে বাগাড়ম্বরপূর্ন নীতিমালা তৈরী হয় যা নারীর প্রতি স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক, এটি বিশ্লেষণ করব। চতুর্থ অংশে, সরকার, উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ও দাতাসংস্থার পারস্পরিক সম্পর্কে নারী কিভাবে প্রান্তিক তা পথবাসীদের উপর উন্নয়ন সংস্থার নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচী বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব।

উন্নয়ন আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতা:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা[৩] বিশ্বের পুরো বিশ্বকে তিনভাগে বিভক্ত করে ফেলার প্রক্রিয়ায় 'উন্নত বিশ্ব' 'অনুন্নত বিশ্ব' এর ধারণায়ণ তৈরী হয়। পুরো পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলার এই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় বিশ্ব নামে একটি বর্গের আবিস্কার করা হয় যেখানে ব্যাপকভাবে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা হয় । নির্মিত এই দারিদ্র্যকে আবার পরিবেশন[৪] করা হয়। 'উন্নয়ন' এর আবিষ্কারের জন্য যে প্রপঞ্চগুলোর আবশ্যিকতা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'তৃতীয় বিশ্ব' এবং এর 'দরিদ্রতা'র আবিষ্কার। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বকে দরিদ্রতামুক্ত করার প্রক্রিয়ায় আনতে হবে, আর এই প্রক্রিয়াই হল উন্নয়ন। এ প্রয়োজন থেকেই ব্যাপক 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'[৫] ঘোষনা করা হয় এবং তা তৃতীয় বিশ্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরী করে নেয়। উন্নয়নের মধ্যে 'দরিদ্রতা' কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, উন্নয়ন ডিসকোর্সে দরিদ্রতাকে সাধারণ দশা হিসেবে নির্মাণ ও উপস্থাপন করা হয়, সামাজিক সম্পর্ক যা অসমতা ধারণ করে মানুষকে দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয় তা আড়াল করা হয় এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে (দরিদ্রতা হ্রাসের পদক্ষেপ এবং কৌশল গ্রহণ সত্ত্বেও) দরিদ্রতা নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ হয়। একইভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যেখানে দারিদ্র্যকে সমরূপ করে দেখা হয়। এর মধ্যকার বহুবিধতাকে না দেখে সাধারণীকরণ করা হয় এবং এর উপর পশ্চিমা হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেয়া হয়। 'দরিদ্রতা' কোন বৈশ্বিকপ্রপঞ্চ ও সমরূপভাবে প্রয়োগযোগ্য সংজ্ঞা নয় এবং কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সময় ও স্থান ভেদে দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন ।

আবার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে যুক্ত না করার ফলে যখন উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাচ্ছিল না এবং দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল তখন এর সাথে যুক্ত হয় নারী। সত্তর এর দশকে এসে দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টায় বড়ধরণের পরিবর্তন দেখা যায়। সত্তর এর দশকের পূর্বেও মনে করা হতো যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া নারী ও পুরুষকে সমানভাবে প্রভাবিত করে, যা ব্যাপকভাবে নারীবাদী সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সত্তরের দশকেই বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে[৬], উন্নয়ন জগতে মতাদর্শিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন নারীর প্রশ্নে নতুন করে মনোযোগ দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ডেনিস তাত্ত্বিক এস্টার বসেরাপ এর কাজ। ১৯৭০ সালের এক যুগসন্ধিক্ষণে প্রকাশিত হয় তাঁর *Women's Role in Economic Development* বইটি যা 'নারী' বিষয়ক চিন্তার জগতে ব্যাপক ভাবে নাড়া দেয়।[৭] প্রকৃতপক্ষে, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রথম উন্নয়ন দশকে নারী বিষয়ের অনুপস্থিতি এবং এস্টার বসেরাপদের মত তাত্ত্বিকদের কাজ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। দারিদ্র্য যে ভীষণভাবে একটি লিঙ্গায়িত[৮] বিষয় ,তা প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসে 'উন্নয়নে নারী'[৯] ধারার মধ্য

দিয়ে সত্তরের দশকের শেষ দিকে। এর মধ্য দিয়ে উন্নয়ন ডিসকোর্সে নারীর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে (নাহার, ১৯৯৯)।

দারিদ্র্যের লিঙ্গীয় ধরন এবং মূলধারার উন্নয়নে নারী ঃ

দারিদ্র্য বিষয়টি লিঙ্গীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন। একজন নারী ও পুরুষ ভিন্ন কারণে দরিদ্র হতে পারে। তাদের দরিদ্রতার অভিজ্ঞতাও ভিন্ন রকমের এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্যও ভিন্ন রকম। লিঙ্গীয় অসমতা ও ক্ষমতা সম্পর্ক অন্যান্য অসমতা ও ক্ষমতার সাথে আন্তঃসম্পর্কিত যা এই ভিন্নতাগুলোর জন্ম দেয়। নারী ও পুরুষের দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা যেমন অসম ও ভিন্ন, তেমনি তাদের দারিদ্র্যকরণের পথও এক নয়। কিন্তু মূলধারায় অ-অর্থনৈতিক বিষয়ের তুলনায় অর্থনৈতিক বিষয়কে পৃথকভাবে গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জীবনে এগুলোর প্রাধান্য ও সম্ভাবনার ভিন্নতাকে দেখা যায় না । মূলধারার উন্নয়নে দরিদ্রতা পরিমাপের জন্য 'দারিদ্র্য সীমা'কে চিহ্নিত করা হয়, যা গৃহস্থলীর গড় আয় বা গৃহস্থালীর ক্রয়ের ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। কিন্তু কেবলমাত্র ক্রয় ক্ষমতাকে গুরত্ব দেয়ার ফলে নারীর প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের যে মতাদর্শ, গৃহস্থালী বন্টনের উপরে লিঙ্গীয় বৈষম্যের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অগ্রাহ্য করা হয় যেগুলো আবার দরিদ্র পুরুষ বা ধনী নারীর তুলনায় দরিদ্র নারীর জন্য ভিন্ন অর্থ তৈরী করে। আবার মূলধারার এ ধারণায়নে দরিদ্র পরিবারের সব সদস্যকে সমান দরিদ্র হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু গৃহস্থালীর আয় পরিবারের সব সদস্যের সমান কল্যাণ নিশ্চিত করে না। বরং গৃহস্থালীর মধ্যে লিঙ্গীয় ও ক্ষমতা সম্পর্কের কারণে পুরুষের তুলনায় নারী মৌলিক চাহিদা ও ক্যালরি পূরণের ক্ষেত্রে যেমন অসমতার শিকার হয় তেমনি উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতিতে পুরুষের তুলনায় নারীর সুযোগ কম থাকার কারণে গৃহস্থালীতে কল্যাণের ক্ষেত্রে এক ধরণের অসমতা কাজ করে। ফলে নারীর দারিদ্র্যকে ক্রয় ক্ষমতা এবং মৌলিক প্রয়োজন দিয়ে বোঝা যাবেনা।

একইভাবে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও লিঙ্গীয় বৈষম্য স্পষ্ট। কারণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মীয় বাধানিষেধের কারণে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের রোগকে কম স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং তাদের হাসপাতালে কম নেয়া হয়। মাতৃ মৃত্যুহার, মেয়ে শিশু মৃত্যুহার বেশী হওয়া এবং গড় আয়ু কম হওয়ার পেছনেও রয়েছে লিঙ্গীয় রূপ। দরিদ্র মানুষের মূল সম্পদ হলো তার শরীর। এই শরীরকে খাটিয়ে সে সম্পদ অর্জন করে । তাহলে স্বাস্থ্যহীনতার অর্থ দাড়ায় সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকা। একই ধরনের রোগ এবং বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ থাকার পরও মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের হাসপাতালে

নেবার ঘটনা অধিক। বিষয়টি সামাজিক লিঙ্গীয় সম্পর্কের সাথে যুক্ত। মা খাদ্য কম পাবার কারণে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আবার নিয়মিত সন্তান জন্মদানের কারণে আরো নাজুক অবস্থায় চলে যায়। মেয়ে শিশুর বয়স বৃদ্ধির সময় কিংবা গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নারীর বঞ্চনার বিষয়টি সামাজিক মতাদর্শ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের সাথে যুক্ত। এভাবে নারীর দরিদ্রতা ও স্বাস্থ্য পরস্পর যুক্ত হয়ে যায়। মূলধারার উন্নয়নে দরিদ্রতা পরিমাপের এই ধারণা উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যেও ক্রিয়াশীল । যেমন: পথবাসীদের নিয়ে গবেষণায় দেখতে পাই, বেসরকারী সংস্থাগুলো পথবাসী কেন্দ্রগুলোতে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু নারীর পুনরুৎপাদন যা নারীকে পুরুষের চেয়ে জৈবিকভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যময় করেছে, তা নিয়ে সংস্থাগুলো চিন্তা করেনি। এক্ষেত্রে নিচের ঘটনাটি প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা যায় -

> গবেষিত সুবিধাভোগী নারীদের মধ্যে একজন, যার নাম নাসরীন (ছদ্মনাম), ১৮ বছরের একজন তরুণী পথবাসী। দেড় বছরের বিবাহিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে বর্তমানে সে কারওয়ান বাজারে তরকারি বিক্রি করে। সুবিধাভোগী হিসেবে সে কেন্দ্রে ঘুমায়, গোসল করে এবং শৌচাগার ব্যবহার করে । বর্তমানে সে গর্ভবতী। তার স্বামী তাকে ছেড়ে গেছে আগেই। এখানে সকল দিক থেকেই সে একভাবে ভাল আছে বলে মনে করে কিন্তু, তার বর্তমান গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসব নিয়ে চিন্তিত কারণ কেন্দ্র থেকে এ ব্যাপারে সে কোন সাহায্য পাবে না।

অর্থাৎ, সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে (জ্বর, সর্দি, কাশি প্রভৃতি) নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা পেলেও, গর্ভকালীন সময়ে কিংবা সন্তান প্রসবের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি তারা নিশ্চিত করেনা। প্রকল্পের পুরুষ সুবিধাভোগীদের স্বভাবতই এ ধরনের কোন সংকট মোকাবেলা করতে হয় না। এখানে পুরুষের পাশাপাশি সব ধরনের সুবিধা পেলেও নারী হিসেবে তার পুনরুৎপাদনের বৈশিষ্ট্যের কারনে সে প্রান্তিক।

একইভাবে গৃহস্থালীর শ্রম বিভাজনে নারীর শ্রমকে অনুৎপাদনশীল ভাবা হয়। কারণ শ্রম বাজারও লিঙ্গীয় পক্ষপাত দুষ্ট। একই ধরন ও একই পরিমাণ কাজে নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মজুরী দেয়া হয়। অন্যদিকে নারীকে কম মূল্যের অথচ অধিক সময় সাপেক্ষ কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। গৃহস্থালীর পরিসরে শাক-সবজি কিংবা হাঁস মুরগী পালন করলে নারীরা এর কোন আর্থিক মূল্য পায়না। কারণ, এ খাত থেকে উপার্জিত অর্থ পরিবারের আয় বলে স্বীকৃত। বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ নারীকে মজুরীবিহীন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখে।

শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের গতিপ্রকৃতি নগর দরিদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামের দরিদ্র নারীদের

তুলনায় নগরের দরিদ্র নারীরা বেশ পিছিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে তীব্র দারিদ্র্যের মুখেও নগরের দরিদ্র মহিলারা অধিক সংখ্যায় অর্থ-কর্মে অংশ নিতে পারছে না। তাদের এই নিম্নহারে অংশগ্রহণের পেছনের কারণ হলো নগর-দরিদ্রদের বেশ কিছু অসুবিধা প্রায় এককভাবে নারীকেই ভোগ করতে হয় এবং প্রধানত এজন্যই তারা শ্রম শক্তিতে অধিকহারে অংশ নিতে পারে না। যেমন: বাইরে থাকাকালীন সময়ে তাদের সন্তানকে কোথায় রেখে যাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নারীর শ্রমকে অনুৎপাদনশীল ভাবার এই প্রবণতা উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কাজের মধ্যেও প্রকাশ পায়। আমাদের গবেষণায় দেখতে পাই , কর্মজীবি পথবাসী মায়েদের ২-৬ বছরের সন্তানদের রাখার জন্য উন্নয়ন সংস্থার দিবা-যত্ন কেন্দ্রের সুবিধা থাকলেও সন্তানের বয়স ২ বছর না হওয়া পর্যন্ত দিবা-যত্ন কেন্দ্রে তাকে রাখা যায় না ফলে ঐ শিশুর মায়েরা সন্তানকে অনিরাপদ কোন স্থানে রেখে কর্মক্ষেত্রে যেতে পারে না । আবার নগরে বাস করার কারণে তার এমন কোন আত্মীয় স্বজনও নেই যার কাছে সে সন্তানকে রেখে কর্মক্ষেত্রে যেতে পারে। ফলে, শিশুটিকে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করাই তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়। । অন্যান্য সকল সুবিধার ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর পার্থক্য না থাকলেও তার জৈবিক মাতৃত্বের[১০] কারণে নারী একভাবে প্রান্তিক। আবার উন্নয়ন সংস্থা নারীর ঘরের বাইরে কাজ করা কে বিবেচনায় না এনেই তাদের প্রকল্পের সেবা প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে কর্মজীবি দরিদ্র নারীর প্রকৃত সমস্যাকে উন্নয়ন সংস্থা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেনা।

দারিদ্র্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য নিরাপত্তাহীনতারও লিঙ্গীয় চরিত্র রয়েছে। নারীর নিরাপত্তাহীনতার ধারণা পুরুষের তুলনায় ভিন্ন। তাই নিরাপত্তাহীনতা যেমন তার দরিদ্রতার সাথে যুক্ত তেমনি সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গীয় মতাদর্শের সাথেও যুক্ত।[১১] যৌন নিপীড়ন দরিদ্র নারীর জন্য লিঙ্গীয় দারিদ্র্যের আরেকটি ধরন। স্বামীর নির্যাতন, কর্মক্ষেত্রে ধর্ষন ইত্যাদি বিষয় নারীর অবস্থাকে আরো প্রান্তিক করে তোলে । তাছাড়া যৌতুক ও বাইরের কর্মক্ষেত্রের বাধা, সামাজিক বিধিনিষেধ নারীর অবস্থাকে আরো প্রান্তিক করে তোলে । পতিতাবৃত্তির সাথে যুক্ততাও সমাজের সাথে নারীর বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের বহি:প্রকাশ। উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের চর্চায় নিরাপত্তাহীনতার এই লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে যায়। যেমন পথবাসীদের মধ্যে করা কাজের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, সুবিধাভোগীরা পথবাসী কেন্দ্রে কেবলমাত্র দিনেই (সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) বিশ্রাম নিতে পারে, রাতে নয়। রাতে নারীদের ফুটপাতে থাকা তাদের যৌন হয়রানির শিকার করে প্রায়শ:ই ধর্ষিত হয় অনেক তরুণী। এক্ষেত্রে পুলিশও অনেক সময় যৌন হয়রানি করে থাকে। আর, এসকল কারণে বেশীর ভাগ নারীই যৌন ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এছাড়াও পথবাসী নারী পুরুষের অন্যতম প্রধান সমস্যা উচ্ছেদ। গভীর রাতে

পুলিশ, র‍্যাব কর্তৃক লাঠির আঘাতে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। আর এ সমস্যা পুরুষের জন্য যতটা না তার চেয়ে নারীর জন্য অনেক বেশী বিব্রতকর।

> শিরীন (ছদ্মনাম), ১৮ বছরের একজন পথবাসী তরুনী। রাতে ফুটপাতে থাকার ফলে প্রায়শই সে পুলিশ কিংবা অন্য পথচারীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। রাজি না হলে জায়গা থেকে বিতাড়িত করার ভয় দেখায়। তাই বাধ্য হয়ে সে যৌনকর্মীর পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। শিরিনের ভাষায়, "ইজ্জত যখন দিমুই, মাগনা দিমু কেন? পয়সা দিয়াই দেই।" (তথ্যসূত্রঃ মাঠকর্ম ২০১৩)।

অর্থাৎ, প্রকল্পে যদি সে রাত্রি নিবাসের সুযোগটি পেত তবে হয়তো তাকে এই পেশায় নিয়োজিত হতে হতো না বলে সে মনে করে। পুরুষের সাথে লিঙ্গীয় ভিন্নতার কারণে প্রকল্পের এই ব্যবস্থাটিতে সে প্রান্তিক নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ, লিঙ্গীয় ভিন্নতার কারনে দরিদ্র পথবাসী নারীদের নিরাপত্তার ধারণাটি যে দরিদ্র পুরুষের তুলনায় ভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনায় এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

আবার নগরবাসের আরও কিছু অতিরিক্ত অসুবিধা শুধুমাত্র নগরের দরিদ্র নারীরাই ভোগ করে। নারী নির্যাতন আর ধর্ষণের শিকার হয় তারা। এছাড়াও নারী ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারও হয় তারা । এই ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়েই গ্রাম থেকে আগত নারীরা বহুক্ষেত্রে যৌন কর্মী হয় এবং অনেক সময় দেশের বাইরেও চালান হয়ে যায়। এতোগুলো বৈষম্যের শিকার হয়ে নগরের দরিদ্র নারীগোষ্ঠী যে তাদের সতীর্থ পুরুষদের তুলনায় আরও অধিকতর মানবেতর জীবন যাপন করবে তা বলাই বাহুল্য (মজুমদার, ২০০৯)।

উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নগরে যে সকল উন্নয়নের চর্চা করে সেখানে লিঙ্গীয় ভিন্নতার সাথে যুক্ত এ সকল সাংস্কৃতিক মতাদর্শকে অগুরুত্বপূর্ণ ধরে নিয়েই উন্নয়ন চর্চা করা হয়। যেমন: পথবাসী কেন্দ্রগুলো সুবিধাভোগী নারী এবং পুরুষের বিশ্রামের জন্য একই ঘরে থাকতে দেয় অথবা বড়জোর একটি কাঠের পার্টিশন বা পর্দা থাকে। বিভিন্ন নারী সুবিধাভোগীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, একই কেন্দ্রে নারী পুরুষ উভয়ের বিশ্রামের সুবিধা দেয়ার কারণে নারীরা প্রতিনিয়ত পুরুষ সুবিধাভোগীদের দ্বারা উত্যক্ততার শিকার হন। এ প্রসঙ্গে গবেষিত সুবিধাভোগী নারীদের মধ্যে একজনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য-

> পান্না (ছদ্মনাম), ২২ বছরের একজন তরুণী পথবাসী। বিয়ের ৮ বছর পর স্বামী তাকে ছেড়ে যায়। বর্তমানে সে তরকারী সংগ্রহ করে বিক্রি করে। উন্নয়ন সংস্থার কেন্দ্রে এসে সে গোসল করে এবং ঘুমায় । অফিসে ছেলে মেয়েদের ঘুমানোর ব্যবস্থা একই সাথে, যদিও মাঝখানে কাঠের বোর্ড দিয়ে পার্টিশন দেয়া আছে কিন্তু স্বামী পরিত্যাক্তা এবং একা হওয়ার কারনে পুরুষ সুবিধাভোগীরা তাকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করেন। তার ভাষ্য মতে, "হাত ধইরা টানাটানি করে, গায়ে হাত দিতে চায়................" ইত্যাদি।

যদিও কেন্দ্রের পুরুষ সুবিধাভোগীদের মতে, তারা এখানে ভাইবোনের মতই থাকেন (তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০০৯)।

অর্থাৎ নারী হওয়ার কারণে তার বিশ্রামের জন্য যে অতিরিক্ত একটু 'আড়াল' দরকার বা পুরুষ সুবিধাভোগীদের থেকে পৃথক বিশ্রামের ব্যবস্থা দরকার তা প্রকল্প অফিস তাকে দিতে পারে না। আর একারণে সে এবং অন্যান্য নারী সুবিধাভোগীরা পুরুষ সুবিধাভোগীদের উত্যক্ততার শিকার হয়। আবার পাচারের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ন হলো পথবাসী নারী শিশু। UNDP থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে চারশ নারী ও শিশু পাচার হয়। যাদের বেশীরভগেরেই বয়স ১২-১৬ এর মধ্যে এবং এদেরকে জোর পূর্বক যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করানো হয়। শুধুমাত্র পাকিস্তানেই প্রতিবছর বিক্রি হয় ৪৫০০ নারী শিশু যারা পরবর্তিতে যৌনকর্মী বা কিছু ক্ষেত্রে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে।

দাম্পত্য অধিকার/স্বত্ব (conjugal entitlement) নারীর জন্য নূন্যতম নিরাপত্তা নিয়ে আসে।[১২] কিন্তু, নগর দরিদ্র পরিবারগুলোতে সাধারণত দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। আর এ ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ মূলত ভরনপোষণ দিতে না পারার কারণেই হয়। সাধারণত নগর-দরিদ্রদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রবণতা খুব বেশী। দরিদ্রদের বিবাহের যেহেতু কোন রেজিস্ট্রেশন নেই সেহেতু কেবল মুখের কথাতেই তা ভেঙ্গে ফেলা যায়। যে সামান্য মোহরানার অঙ্গীকার থাকে তা প্রদান করতে বাধ্য করার জন্যও কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

উন্নয়ন সংস্থার নারী সদস্যদের অনুমতিতে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নারীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিবাহ নিবন্ধীকরণ ছাড়াও পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে দেনমোহরের নিশ্চয়তাও নিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু আমরা কথা বলে জেনেছি যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছুদিন পরেই ঐ দম্পতিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েকদিন পরে নারী সদস্য একাই ফিরে আসে, স্বামীর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, দেন মোহর তো দূরের বিষয়। ফলে স্বভাবতই ঐ নারী আবার পথে আশ্রয় নেয় এবং প্রথাগত নিরাপত্তার যে ধারণা অর্থাৎ স্বামী থাকা মানেই নিরাপদ, সেটি হারায়। আর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও তার প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে নারীর এই প্রান্তিকতার স্থানটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তবে উন্নয়ন সংস্থাগুলো পথবাসী নারীদের জন্য যে কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করে সেগুলোর সীমাবদ্ধতা থাকলেও নারীরা এতেই খুশী। প্রান্তিকতার এই চৈতন্য নারীর নিজের মধ্যেই তৈরী হয় না। আবার নারীদের সুবিধার্থে নতুন নতুন আইন তৈরী হয় ঠিকই কিন্তু, এই আইন বাস্তবায়ন তো দূরের কথা এগুলো তাদের বলার মতো কেউ নেই। সরকার বলে থাকে, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তারা করে না। কিন্তু, নারীরা তাদের এই অধিকার সম্পর্কে জানেই না।

রাষ্ট্রের পলিসি প্রক্রিয়ায় দরিদ্র নারীর অবস্থানঃ

রাষ্ট্র শ্রেণী এবং লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়, ফলে এই ভিন্নতাগুলোকে আমলে না এনেই রাষ্ট্র তৈরী করে তার পলিসি প্রক্রিয়া। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের যেকোন কর্মসূচীতে এর প্রভাব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে মূলধারার উন্নয়ন ধারণায়ণে এই লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে দেখা হয় না এবং নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটে না। রাষ্ট্রের পলিসি প্রক্রিয়ায় (যেমন: পিআরএসপি, জেন্ডার বাজেট) যে দরিদ্র নারীর লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরন দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি), যেটি তৈরির প্রক্রিয়াতেই নারীর দারিদ্র্যের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বাদ পড়ে যায়[১৩]। এ প্রসঙ্গে নায়লা কবীর (১৯৯৪) বলেন, বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরূপন পলিসি সামগ্রিক দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে বুঝতে অক্ষম; বিশেষত দারিদ্র্যের লিঙ্গীয় ধরনকে। তিনি মনে করেন, নারীর এই ধরনের দারিদ্র্যকে মূল দারিদ্র্য পলিসিতে সঠিকভাবে বুঝতে প্রয়োজন ভিন্ন বা বিকল্প পরিমাপন এবং তা হবে দারিদ্র্যের লিঙ্গীয় ধরন বা 'Gender dimension of poverty' ।

দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) একটি দেশের দারিদ্র্যের মূল উপাদান আলোচনার ক্ষেত্রে একক হিসেবে গৃহস্থালীকে ধরে নেয়। অথচ পথবাসী দরিদ্র নারীদের উপর করা মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, নারী একাই ফুটপাতে ঘুমাচ্ছে, হোটেল থেকে খাবার কিনে খাচ্ছে, আবার কাজের সময় কাজ করতে যাচ্ছে। বিশেষ করে যৌন ব্যবসায় নিয়েজিত নারীদের ক্ষেত্রে এটি বেশী দেখা যায়। আত্মীয় স্বজনতো নয়ই, আশেপাশের কারো সাথেই তার তেমন কোন সংশ্রব নেই। তথাকথিত নৈতিকতার বোধ থেকে সবাই তার কাছ থেকে একভাবে দূরে থাকতে চায়। অর্থাৎ, পলিসি প্রক্রিয়ায় যেভাবে ধরেই নেয়া হয় নারীর গৃহস্থালী থাকবেই সেটি সর্বদাই সত্য নাও হতে পারে।

বৈশ্বিকভাবেই দারিদ্র্য দূরীকরণ পলিসি পিআরএসপিতে নারীর দারিদ্র্যের বিষয়টির অনুপস্থিতি চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে হোয়াইটহেড (২০০৩) উল্লেখ করেন, অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সারা বিশ্বব্যাপী নারীদের উপর যে দারিদ্র্যের বোঝা রয়েছে তা নিবারণ করা এবং জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের মাত্রা প্রশমনে পিআরএসপি গুলোর উচিত দরিদ্র পুরুষের পাশাপাশি দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্যকেও তুলে ধরা। তিনি প্রস্তাব করেন, যদি জাতীয় সরকারগুলো কার্যতই দারিদ্র্য দূর করতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই পুরুষের মত নারীর দারিদ্র্যকেও তুলে ধরতে হবে। দারিদ্র্যের পরিমাপনের প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনায় লেখক উল্লেখ করেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রে পিআরএসপি এর পরিমাপনের খুব কম সংখ্যক মূল্যায়নেই লিঙ্গীয় বিষয়টাকে গুরুত্বসহকারে দেখেছে। তিনি আরো মনে করেন, বিশ্বব্যাংক 'পিআরএসপি'তে জেন্ডার

বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে কিন্তু লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ এবং পলিসির ক্ষেত্রে এর মাত্রা ও প্রকৃতি নিরূপণ খুবই দূর্বল। যেমন, হোয়াইটহেড (২০০৩) উল্লেখ করেন, পিআরএসপিগুলোতে লিঙ্গীয় বিষয়টি এসেছে খুবই খাপছাড়া অবস্থায় এবং সীমিত পরিসরে। মূলধারায় লিঙ্গীয় বিষয়টিকে খন্ডিত ইস্যু হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে লেখক বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্য পলিসির উদাহরণ টেনে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তার মতে, যদিও কোথাও কোথাও লিঙ্গভিত্তিক দারিদ্র্যকে নিরূপণ করা হয়েছে কিন্তু পলিসি ও বাজেটে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই ক্ষেত্রে মূলত জেন্ডার ইস্যুকে Women in Development (WID) এর আকারে উপস্থাপন করা হয়। এই ক্ষুদ্র পলিসিগুলো নারীর বঞ্চনার কথা তুলে ধরে কিন্তু নারীর প্রান্তিকতার মাত্রাকে লিঙ্গীয় ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়।

একইভাবে রাষ্ট্রের পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের কারণে বাংলাদেশের বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে বারবার পিছিয়ে যায়। ২০০১ সালের প্রথম দিকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের গৃহীত পরিকল্পনা জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জন করতে পারেনি। বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার মধ্যে একটি বিশেষ শর্ত হলো - যেসব ক্ষেত্রগুলোতে নারী পুরুষের চাইতে পিছিয়ে পড়ে আছে সেসব ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমপর্যায়ে তুলে আনার জন্য দেশের সরকারকে নারীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করে করনীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে (এলসন, ১৯৯৭; উদ্বৃত হয়েছেন, পাল-মজুমদার ২০০৯)। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়- এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার আগেই তাকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এই অসম প্রতিযোগিতায় হেরে নারী আরও এক ধাপ লিঙ্গীয় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ধীরে ধীরে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বদলে তার বিপরীত দিকেই ক্রমশ এগিয়ে চলছে । জাতীয় বাজেটের কল্যাণমুখী ক্ষেত্রটিতে নারীর জন্য যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয় তার বেশীর ভাগই বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, বিদেশী মুদ্রায় অর্থায়িত হয়। তার উপর প্রতিটি প্রকল্পই দাতাগোষ্ঠীর বিবেচনামত গ্রহণ করা হয়। যার ফলে বহু ক্ষেত্রেই নারীর বাস্তব প্রয়োজনের সাথে প্রকল্পের কর্মকান্ডের অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় (মজুমদার, ২০০৯) ।

প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রের ধরনগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্রের পলিসিসমূহ নারীদের সামাজিক জীবনকে আক্রান্ত করে, এবং একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত চর্চাই নির্ধারণ করে দেয় নারীদের নিজস্ব জীবনযাত্রার উপর তাদের কতটুকু নিয়ন্ত্রণ থাকবে। প্রাক রাষ্ট্রীয় সমাজে নারী পুরুষের সমান ক্ষমতা থাকলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এসে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়[১৪]। রাষ্ট্রের বিচারে নারী এবং পুরুষ কি

ধরনের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে তাও রাজনীতিকরণ বা গঠন করে। এমনকি যে সমস্ত রাষ্ট্রে নারীর দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে সেখানকার তুলনামুলক তথ্য থেকেও দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ভূমিকা পুরুষ প্রভুত্বকারী হিসেবে থেকে যায় (মুর, ১৯৮৯)।

রাষ্ট্র ও তার মতাদর্শিক প্রভাব উন্নয়ন সংস্থাসমূহের উপর প্রভাব ফেলে। আর, এই প্রভাব অবধারিতভাবেই উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী দরিদ্র নারীর জীবনে প্রান্তিকতা তৈরী করে। উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৭৫% নারী কেন্দ্রের মধ্যেই নিযার্তন এর শিকার হচ্ছে। এটি নিয়ে উন্নয়ন সংস্থার কাউন্সিলিং পিতৃতান্ত্রিক আদলেই হয়। কাউন্সেলিংটা মূলত হয় এভাবে যে নারী স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয় তাকে বোঝানো হয়- “স্বামীর কথাতো শুনতে হবে। স্বামী যা চায় তা না করলেইতো হয়” (তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০১৩) ।

আবার পথবাসীদের মধ্যে করা কাজে দেখতে পেয়েছি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সোয়েটার তৈরীর কাজ কিংবা কারিগরি যেকোন কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থায় ছেলে ও মেয়ের অনুপাতে বৈষম্য থাকে। পোষাকশিল্পের অধিক শ্রমের কাজ কিংবা কারিগরি কাজ নারীরা পারবে না বলেই ধরেই নেয়া হয় ফলে নারীদের সাধারণত গৃহস্থালীর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কাজ যেমন, বাঁশ, বেতের কাজ কিংবা হস্তশিল্প প্রভৃতি কাজে উৎসাহিত করা হয়। অথচ গবেষণায় দেখতে পাই, ফুটপাতে বসবাসরত নারীদের পেশা ও পুরুষদের পেশা অনেকক্ষেত্রে একই। ফুটপাতের পুরুষরাও যেমন তরকারী সংগ্রহ করে বিক্রি করে তেমনি নারীরাও। সুতরাং নারীর সামর্থ্য কেন্দ্রিক উন্নয়ন সংস্থার এই যে ভাবনা এটি অবধারিত ভাবেই রাষ্ট্রের পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের আদলে গড়ে উঠেছে সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরকার, উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ও দাতাসংস্থার পারস্পরিক সম্পর্কে নারীর প্রান্তিকতা ঃ

বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ পরিচালিত করতে এখন পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার দাতাগোষ্ঠীর সমর্থনে বৃহৎ পরিসরে বিশেষত গ্রামীণ ও নগর এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণের নীতি গ্রহণ করেছেন। নগর দরিদ্র পথবাসীদের নিয়ে সরকারের সাথে বেসরকারী সংস্থার এসকল যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মনে করা হলেও সরকারের সাথে স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও দাতা সংস্থাসমূহের সম্পর্ক, উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে। আবার অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একধরনের রাজনীতি কাজ করে যা বিভিন্ন সরকারের সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়।

উন্নয়ন সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছেন- দাতা সংস্থার শর্তগুলো তাদের মানতে হয়। সংস্থা থেকে বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। যেমন: নারীদের ক্ষেত্রে বাঁশ ও বেতের কাজ, হাঁস-মুরগী পালন প্রভৃতি। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়নের অভাবে এই প্রশিক্ষণ তাদের কোন কাজেই লাগে না। কারণ বাঁশ, বেত কিনে ব্যবসা করা কিংবা হাঁস-মুরগী কিনে পালন করার মত অর্থই তাদের হাতে থাকে না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর মত কোন জায়গাই নেই ফুটপাতে বসবাসরত এই সকল পথবাসী নারীদের। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পগুলো নেয়া হয়ে থাকে দাতাদের অর্থায়নে দাতাদের শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে যার সাথে বাস্তবের কোন মিল থাকে না। ফলে নারীর প্রান্তিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ থাকে না।

তবে, নগর দারিদ্র্য নিয়ে দাতা সংস্থার আগ্রহ কম। তারা সাধারণত গ্রামীণ দারিদ্র্য নিয়ে কাজ করতে চায়। কারণ হিসেবে তারা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে ঝুঁকির কথা বলেন। গ্রামে জনগণের আবাস স্থায়ী। তারা ঋণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে না বা ঋণ পরিশোধে একভাবে বাধ্য থাকে। কিন্তু, শহরে এর নিরাপত্তা নেই। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আজ এখানে, কাল সেখানে। এ কারণে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও তেমন করা হয়নি। অর্থাৎ দরিদ্র নারী পুরুষের জীবনের দারিদ্র্য বিমোচনের চেয়েও উন্নয়ন সংস্থার কাছে যে বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তার হলো ঋণের টাকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। পথবাসীদের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা আরো বেশী (তথ্যসূত্র: মাঠকর্ম ২০১৩)।

উপসংহার :

উন্নয়ন জগতে 'তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতা' আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় 'তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র' এই দেশগুলোর জন্য 'উন্নয়ন'কে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা হয়, যার ফলাফল হিসেবে আবার আবির্ভূত হয় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা। এই উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য দূরীকরনের ক্ষেত্রে যে পলিসিগুলো গ্রহণ করে সেখানে দারিদ্র্যকে সমরূপ করে দেখানোর পাশাপাশি একে বৈশ্বিক প্রপঞ্চে পরিনত করা হয়। দারিদ্র্যের রয়েছে জটিল ও বহুমাত্রিক রূপ। এর সার্বজনীন সংজ্ঞায়ন কিংবা বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপন সম্ভব নয়। নারী পুরুষের দারিদ্র্যের কারণ, দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে উত্তরণের পথ সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শ গত কারণে ভিন্ন হয়। কিন্তু রাষ্ট্র এবং দাতা সংস্থাসমূহের পরস্পরিক সমঝোতায় যে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীগুলো নেয়া হয় সেখানে এই ভিন্নতাগুলোকে অস্বীকার করা হয়। এছাড়াও দরিদ্র নারী ও পুরুষকে সমগোত্রীয় হিসেবে দেখানোর ফলে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীগুলোর মধ্যে নারী তার পূর্বের দরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরণের পরিবর্তে আরো বেশী অধস্তন হয়ে যায়। এ বিষয়গুলো পথবাসী দরিদ্র নারীদের উন্নয়ন

সংস্থার জন্য নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচী বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে নারীর লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে অস্বীকার করা হয়, নারীর পুনুরুৎপাদন, জৈবিক মাতৃত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয় এবং সর্বোপরী দাতাসংস্থার টার্গেট পূরনের জন্য যে সকল নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তা দরিদ্র পথবাসী নারীদের প্রকৃত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ফলে দারিদ্র্যকে দেখার ক্ষেত্রে দারিদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শকে বিবেচনায় না আনা হলে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে লিঙ্গীয় বৈষম্য উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে।

টীকা :

১. লেখকদ্বয়ের মধ্যে একজনের স্নাতোকোত্তর এর গবেষণা কাজের মাঠকর্ম এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সংস্কার ও দায়িত্বের ধারণার ফলে পুরুষের চাইতে দারিদ্রে নারীর জীবনকে জটিলতর ও ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এবং দারিদ্র্যের লিঙ্গীয় মাত্রার জন্ম দেয়। দেখুন, Kabeer, N. (1994) "The emergence of women as a constituency in development", *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought,* London: Verso.

৩. 'পশ্চিম' শব্দটি এখানে ভৌগলিক অর্থে নয় বরং আর্থ-রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, নেটওয়ার্ক সমূহকে বুঝাচ্ছে যা শুধু তৃতীয় বিশ্বই নয় বরং পুরো পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

৪. দরিদ্রদের সক্রিয়তাকে অস্বীকার করে ও দারিদ্র্যকে অনৈতিহাসিকভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে মূলত উন্নয়ন সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপ বৈধতার রাজনীতিকে আড়ালে রাখা হয়। দেখুন, Green, Maia (2003) "Representing Poverty and Attacking Representations: Some Anthropological Perspectives on Poverty in Development", The work was part of the programme of the ESRC Global Poverty Research Group, Manchester, UK.

৫. ১৯৪৯ সালের ২০শে জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে Hanry S Truman পুরো বিশ্বের জন্য 'ন্যায্য হিসাব নিকাশ' (Fair deal) এর ধারণার বিষয়টি ঘোষনা করেন। এ ধারণার মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের টেকনিক্যাল জ্ঞানের ভান্ডার থেকে এই সকল দারিদ্র্য পীড়িত দেশগুলোকে সহায়তার কথা বলেন, যাতে তারা (অনুন্নত দেশের জনগণ) নিজেদের জন্য সবচেয়ে ভালো জীবনের আকাঙ্ক্ষাটি অনুভব করতে পারে।

দেখুন, Escobar, Arturo (1995) *Encountering Development: The Making and Unmaking of The Third World.* New Jersey: Princeton University Press।

৬. দেখুন, Redistribution with Growth (Chenery 1974), The Assault on World Poverty (WB 1975), The ILO's Employment, Growth and Basic Needs: A One - World Problem (1976)

৭. বসেরাপ (১৯৭০) , আফ্রিকার সাব সাহারান অঞ্চলে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে দেখান পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আধুনিকায়নের উন্নয়ন কৌশল নারীর জন্য প্রতিকূল ফলাফল নিয়ে আসছে। উন্নয়নে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়, তা অর্জনের জন্য বানিজ্য ভিত্তিক কৃষি ও শিল্পায়ন প্রধানত পুরুষদেরই কর্মে নিয়োজিত করছে।

৮. প্রাগুক্ত

৯. সত্তর এর দশকে আমেরিকান উদারনৈতিক নারীবাদীদের ভাবনা ও অনুভূতিতে স্পষ্ট রূপ পায় WID, WID স্কুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিকীকরণ, বিশেষ করে প্রাশ্চাত্যের উন্নয়ন মডেলের সুবিধা নারীদের কাছে ছড়িয়ে দেয়া, প্রাশ্চাত্যের উদারনৈতিক নারীবাদীদের মত WID চিন্তাবিদরা আইনানুগ ও প্রশাসনিক পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের যুক্ত করতে চায়। সে সময়েই দেখা গেল আধুনিকীকরণের সুবিধাসমূহ নারীদের কাছে পুরোপুরি এবং ক্ষেত্র বিশেষ আংশিকও পৌছে না বরং কিছু ক্ষেত্রে নারীদের বিদ্যমান অবস্থাকে ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত করে।

১০. র‍্যাডিকেল ধারার নারীবাদীরা নারীর পুনরুৎপাদন এবং জৈবিক মাতৃত্বকেই নারীর অধস্তনতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। দেখুন, Tong, Rosemarie. (1989). "Feminist th ought, A Comparative Introduction, West View Press, Inc.

১১. নায়লা কবীর (১৯৯৪) মনে করেন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় বাধানিষেধ এবং নিরাপত্তাহীনতারও রয়েছে লিঙ্গীয় চরিত্র, যা দারিদ্র্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণে দরিদ্র নারীর অভিজ্ঞতা দরিদ্র পুরুষের থেকে ভিন্ন। দেখুন , Kabeer, N. (1994) "The emergence of women as a constituency in development", *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought,* London: Verso.

১২. অমর্ত্য সেন দেখান, বাংলাদেশের সমাজে নারীর সত্ত্বের ধারণা অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের সাথে বিজড়িত। তাই বিয়ে দরিদ্র নারীর জীবনে একধরনের নিরাপত্তার বোধ তৈরী করে। দেখুন, Sen, A. (1990), "Gender and Co-operative Conflicts". Persistent Inequalities: Woman and World Development, *In Tinker Iren Tinker (ed), New York, Oxford University Press.*

১৩. PRSP গঠন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র নারীর অংশগ্রহণ থাকে সীমিত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে না এবং এর অধিকাংশ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় পুরুষকে মাথায় রেখে।

১৪. নারীর অধস্তনতার ঐতিহাসিক রূপান্তর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই- নারী সর্বদাই অধস্তন ছিল না। আদিম সমাজে (কিংবা এখনও যে সকল সমাজে, গৃহস্থালীর কাজের সাথে বাইরের বা সামাজিক কাজের কোন পার্থক্য নেই এ সকল সমাজে) নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের সমপর্যায়ে। এমনকি, নারী পুরুষের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। সে সময়ে, উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের উপর সমাজের সকলের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিল, গার্হস্থ্য জীবন ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রে ছিল যৌথ গৃহস্থালী (Communal household)। লিঙ্গীয় ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পুরুষের মতোই নারীর ভূমিকার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল। ক্ষমতা, কর্তৃত্ব শুধুমাত্র পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকার পরিবর্তে নারীর হাতেও ছিল। এ ধরনের সংস্কৃতিতে নারী যেমন অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করতো তেমনি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক যৌন অধিকার ছিল (এঙ্গেলস, ১৮৮৪)। কিন্তু, ধীরে ধারে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব হয় এবং নারী সম্পদ, উৎপাদিত দ্রব্য ও তার নিজের উপর কর্তৃত্ব হারায়। নারী এই উদ্বৃত্ত ভোগ করতে পারে কিন্তু, এর মালিকানার অংশ পায় না। যৌথ গৃহস্থালীগুলো ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক এককে পরিণত হয়, প্রতিটি পরিবারে (বর্ধিত অথবা একক পরিবার) একেকজন পুরুষ প্রতিনিধিত্ব করেন। পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হয় নারীর শ্রম, যা কিনা পর্যায়ক্রমে বৃহৎ সামাজিক বা বাইরের জগতের নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়- যে বর্হিবিশ্বের জগৎ আবার রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত- আর এই সমাজ, রাষ্ট্র সব কিছুই হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্র।. দেখুন, Engles, Friedrich (1972) [1984] *The Origin of the Family, Private Property and State in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan,* New York: International Publishers.

তথ্যসূত্রঃ

Boserup, E. (1970). *Women's Role in Economic Development*, London: Allen & Unwin.

Brock, K. C., A. and Gaventa, J. (2001). Power, knowledge and political spaces in the framing of poverty policy, *IDS Working Paper*, Brighton, Sussex, UK.

BBS, (2008) *Census of slum areas and Floating population* (Dhaka: Bangladesh Bureau of statistics).

Chambers, R. (2005) *Ideas for Development*, Earth scan: Landon, UK.

Elson, D. (ed) (1991). *Male bias in the Development Process.* New York: Manchester University Press.

Engles, F. (1972) [1984] *The Origin of the Family, Private Property and State in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan*, New York: International Publishers.

Escobar, A. (1995) *Encountering Development: The Making and Unmaking of The Third World.* New Jersey: Princeton University Press.

Esteva, G. (1993) Development in Wolfgang Sachs (ed.), *The Development Dictionary: A guide to Knowledge as Power.* London & New York: Witwatersrand University Press.

Ferguson, J (1990) *The Anti-politics Machine: 'Development', Depoliticisation, and Bureaucratic Power in Lesotho.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Green, M. (2003) *Representing Poverty and Attacking Representations: Some Anthropological Perspectives on Poverty in Development,* The work was part of the programme of the ESRC Global Poverty Research Group, Manchester, UK.

Guhathakurta, M. (1994) The Aid Discourse and the politics of Gender: A Perspective from Bangladesh, *Journal of Social Studies* 65: 101-114

Jahan. R. (1995) *The Elusive Agenda: Mainstreaming Women in Development.* University Press Limited, Dhaka. Bangladesh.

Kabeer, N. (1994) The emergence of women as a constituency in development, *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought,* London: Verso.

Rahnema, M (1997) Development and the peoples immune system: The story of another variety of AIDS In *The Post-Development Reader.* Dhaka: The University Press.

Compiled and introduced by Majid Rahnema with Victoria bawtree , Dhaka: The University Press

Sachs, W (1992) Introduction in W. Sachs (ed.) *The Development Dictionary: A guide to Knowledge as Power.* London: Zed Books.

Sen, A. (1990), Gender and Co-operative Conflicts. In Tinker Iren Tinker (ed) *Persistent Inequalities: Woman and World Development*, New York, Oxford University Press.

Alam, S. M. N. & Rahman, S. (2009*) A report on the baseline study for Amrao Manush project*, Concern Worldwide Bangladesh, Dhaka.

Tong, R.. (1989). *Feminist thought, A Comparative Introduction*, West view Press, Inc.

Vishanathan, N (1977) *The Women, Gender and Development Reader: Introduction to Part1*, the University Press, Dhaka.

White, S. C. (1992) *Research on women in Bangladesh: Arguing with the crocodile, gender and class in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka. Bangladesh.

Whitehead, A. (2003) *Failing women, sustaining poverty: Sender in Poverty Reduction Strategy Papers*, Report for the Gender and Development Network, GAD, UK.

World Bank (2007) Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor, *Bangladesh Development Series* Paper No. 17. Dhaka: The World Bank Office.

ইসলাম, ফারজানা (২০০৬) নগর দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে গৃহস্থালী প্রত্যয়ঃ লিঙ্গীয় দৃষ্টি, *ভূগোল ও পরিবেশ জার্নাল*, সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যা, ২০০৫, প্রকাশকাল ২০০৬।

নাহার, আইনুন (১৯৯৯) বাংলাদেশে নারী, উন্নয়ন এবং মৌলবাদ। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা* (নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জার্নাল), সংখ্যা ৪।

মজুমদার, প্রতিমা-পাল (২০০৯) শহুরে দারিদ্র্য, বস্তির জীবন ও কিছু 'মিথ', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*।